প্রতিবেদন

- ißvwb evo‡Q wØ¸Y nv‡i
- 62 †`‡k ißvwb n‡"Q
- GjwWwmf³ †`k¸‡jvi g‡a¨ evsjv‡`‡k ißvwb evo‡Q
- 97 fvM wbR¯ Pwn`v ciY Ki‡Q

I la wk‡í

nvRvi †KwU UvKv ißvwbi nvZQvwb

আসাদুর রহমান ও শেখ আশরাফ আলী

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প একটি বড় রপ্তানি পণ্য হতে চলেছে। তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র রাষ্ট্র হয়েও এ দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো যে মানের ওষুধ তৈরি করছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক। দেশের বাজার ছেড়ে বিশ্ববাজারে এ দেশের ওষুধ প্রবেশ করেছে কয়েক বছর আগে। মানসম্পন্ন ওষুধের জন্য বিশ্ববাজারে এ দেশের ওষুধ প্রশংসা পাচ্ছে। ফলে প্রতি বছর বাড়ছে রপ্তানির পরিমাণ। এক হিসাবে দেখা যায়, ২০০১-০২ অর্থবছরে ৪০ কোটি ২৬ লাখ, ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৫৫ কোটি ২৪ লাখ এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৭৭ কোটি ৪০ লাখ টাকার ওষুধ বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হার প্রায় ১০০ ভাগ। ধারণা করা n‡"Q কয়েক বছরের মধ্যে রপ্তানি হাজার কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে। গুণগতমান আর স্বল্পমূল্যের কারণে বিদেশের বাজারে বাংলাদেশী ওষুধের ব্যাপক সুনাম অর্জিত হয়েছে। বলতে গেলে কোনো প্রকার সরকারি সহায়তা ছাড়াই প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব উদ্যোগেই এই সফলতা হয়েছে।

মূলত এরশাদ সরকারের আমলে এ দেশে ওষুধ শিল্পের পটপরিবর্তন ঘটে। তৎকালীন সরকারের উদার ওষুধনীতির কারণে দেশে বেশ কিছু বড় পর্যায়ে ওষুধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। মূলত সেখান থেকেই যাত্রা শুরু। এরপর আর এ শিল্পকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। উত্তরোত্তর মান বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হওয়া এ দেশের ওষুধ শিল্প আজ শক্ত একটি ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শিল্পটি অবকাঠামোগত দিক দিয়েও বেশ শক্তিশালী। বাংলাদেশের মানুষের যে পরিমাণ ওষুধ সারা বছর প্রয়োজন হয় তার ৯৭ ভাগ এ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো পূরণ করছে। বাকি ৩ ভাগ বিভিন্ন ভ্যাকসিন ও ক্যানসার ড্রাগ। এগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ভ্যাকসিন ও ক্যান্সার ড্রাগ ছাড়া অন্যান্য ওষুধগুলো দেশ-বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করে থাকে।

ছোট-বড় ১৬৪টি ওষুধ কারখানা রয়েছে এ দেশে। দেশের চাহিদার প্রায় সিংহভাগ পূরণ করার পর প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে। বিশ্বের সর্বমোট ৬২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে এ দেশের তৈরি ওষুধ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, চিলি, ফ্রান্স, সুদান, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, তাইওয়ান, ইউক্রেন, পাকিস্তান, মিয়ানমার, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইয়েমেন, কেনিয়া, ভিয়েতনাম, কসোভো, লিবিয়া, ঘানা, সিয়েরালিওন, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, তানজানিয়া, মোজাম্বিক, ভুটান, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মরিসাস প্রভৃতি দেশ। রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ইইউর বাজারে ঢুকতে চাচ্ছে। মানের দিক থেকেও তারা সে বাজারে ওষুধ বিক্রির সামর্থ্য রাখে। কিন্তু ইইউ'র বাজারে কোনো ওষুধ প্রবেশ করাতে বেশ কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। যেমন- যে দেশ রপ্তানি করতে চায় তার 'ড্রাগ মাস্টার

সার্টিফিকেটের' হয়। সেটা করতে প্রায় ৩/৪ বছর লেগে যায়।

দেশের ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখছে। এক হিসাবে জানা যায়, এ দেশের ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে ২ লাখ কর্মচারী-শ্রমিক নিয়োজিত। আর পরোক্ষভাবে এর পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ। ধারণা করা হচ্ছে, ওষুধের কাঁচামাল তৈরি করার মতো শিল্প প্রতিষ্ঠান এ দেশে স্থাপন করা হলে কর্মসংস্থানের এ হার দ্বিগুণে গিয়ে দাঁড়াবে।

বিদেশে এ দেশের ওষুধ কারখানা

এ দেশে তৈরি ওষুধ আজ বিশ্বে সমাদৃত। চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এ দেশের ওষুধ প্রতিষ্ঠানের প্ল্যান্ট স্থাপিত হচ্ছে বিদেশের মাটিতে। সেখানেও প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশংসার সঙ্গে ব্যবসা করে যাচ্ছে। যেমন বেক্সিমকো। পাকিস্তানে তাদের বেক্সি ফার্মা নামে একটি ওষুধ প্ল্যান্ট রয়েছে। সেখানে ১৩৫ রকমের ওষুধ তৈরি হয়। জানা যায়, পাকিস্তানের ওষুধ চাহিদার ১৬ থেকে ১৮ ভাগ সরবরাহ করছে এই প্রতিষ্ঠানটি। পাকিস্তানের বাজারে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শুধু পাকিস্তান নয়, নেপাল, মিয়ানমার, ভুটানের মতো দেশগুলোতে এ ধরনের প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারত আর ইউরোপীয় কাঁচামাল

এ দেশে তৈরি ওষুধের যে পরিমাণ কাঁচামাল প্রয়োজন তার ৩০% এ দেশেই উৎপন্ন হয়। বাকি ৭০ ভাগের জন্য ইউরোপ ও ভারতের ওপর নির্ভর করতে হয়।

বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো ভারত, ইটালি, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে ওষুধের কাঁচামাল সংগ্রহ করে। ইউরোপের যে সব দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করা হয়, মানের দিক থেকে সে সব কাঁচামাল খুবই উন্নতমানের। ভারত ওষুধ শিল্পে বিরাট অগ্রগতি অর্জন করলেও এদের কাঁচামাল নিয়ে বিশ্ব ওষুধ বাণিজ্যে সমালোচনা রয়েছে। তবুও বাধ্য হয়েই আমাদের একটি বড় পরিমাণ কাঁচামাল ভারত থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ-এর সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং) আবুল বাশার দেওয়ান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'কিছু ওষুধ আছে যেগুলোকে Over the counter Drug বলে। এগুলোর দাম সরকার নির্ধারণ করে দেয়। নির্ধারিত মূল্যে ওষুধ বানাতে গিয়ে ভারতের কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। কারণ ইউরোপীয় বা আমেরিকান দেশগুলো থেকে কাঁচামাল আনলে দাম বেশি পড়ে যায়।

বর্তমানে ৩০ ভাগ ওষুধের কাঁচামাল দেশে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু চাহিদার সবটুকু কাঁচামাল এ দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। ওষুধের কাঁচামাল তৈরির প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু বাজার ছোট বলে কেউ এগিয়ে আসে না। এ প্রসঙ্গে আবুল বাশার দেওয়ান বলেন, 'এ সমস্যা সমাধানে সরকার একটি অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট পার্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কয়েক বছর আগে। কিন্তু তা এখনো বাস্তবায়ন হচ্ছে না।' এই পার্ক স্থাপন করা হলে ওষুধের দাম আরো কমানো সম্ভব হবে। তাছাড়া বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করে আবুল বাশার দেওয়ান বলেন, 'রপ্তানির ক্ষেত্রে ড্রাগ, কাস্টমস্, ব্যাংক প্রভৃতি ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। এগুলো খুবই ঝামেলাপূর্ণ। তাছাড়া মার্কেটিংয়ের জন্য প্রোডাক্ট প্রমোশন সাপোর্ট যেমন সেমিনার ও অন্যান্য প্রচারণার দরকার হয়। এসবের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে কাস্টমস থেকে ছাড়া পাওয়া খুবই ঝামেলাপূর্ণ। রপ্তানির ক্ষেত্রে সমস্যার আর একটি বড় দিক হলো স্যাম্পল পাঠানো। স্যাম্পল পাঠানোর ক্ষেত্রে কাস্টমস ৩-৪ কেজির বেশি পাঠাতে রাজি হয় না। কিন্তু এতটুকুতে সঠিক প্যারামিটার করা যায় না।

রয়েছে আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা

স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী পেটেন্ট রাইট ব্যতীত সব ধরনের ওষুধ রপ্তানি করতে পারবে। এ ধরনের ওষুধকে বলে জেনেটিক ওষুধ। আগে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল চীন ও ভারত। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস চুক্তি অনুযায়ী গত ১ জানুয়ারি থেকে দেশ দুটি জেনেটিক ওষুধ রপ্তানির অধিকার হারায়। ফলে বাংলাদেশের জন্য ওষুধ রপ্তানির একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের ওষুধ সমিতির প্রেসিডেন্ট এস এম শফিউজ্জামান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ডব্লিউটিওর ট্রিপস চুক্তির আওতায় ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এলডিসি ব্যতীত অন্য দেশগুলো পেটেন্ট রাইট ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ রপ্তানি করতে পারবে না। কিন্তু পেটেন্ট ওষুধ জেনেটিক ওষুধের চেয়ে দামি বলে অন্য রপ্তানিকারক দেশগুলোর রপ্তানির ক্ষেত্রে দামের বিষয়ে পিছিয়ে পড়বে। এ নিয়মের বাইরে এলডিসিভুক্ত ৪৯টি দেশই কেবল জেনেটিক ওষুধ রপ্তানি করতে পারবে। এটা বাংলাদেশের জন্য একটা বড় সুযোগ। কারণ বাংলাদেশ ছাড়া এলডিসির ৪৮টি দেশেই ওষুধ আমদানি নির্ভর। রপ্তানি করে শুধু বাংলাদেশে।' আগে এই সুবিধা নিত চীন ও ভারত। ২০০৫ সাল থেকে তাদের এই সুবিধা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ এই সুযোগ পাবে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। আর এই সময়টুকুকে বাংলাদেশের যথাযথ কাজে লাগাতে হবে।

বাংলাদেশের এই সম্ভাবনাময় শিল্পটির দিকে আমাদের বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো হতে পারে আমাদের ওষুধ শিল্পের জন্য বড় বাজার। সে জন্য প্রয়োজন এ খাতে বিভিন্ন ইনসেনটিভ দেয়ার। এ প্রসঙ্গে এস এম শফিউজ্জামান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা সরকারের কাছে ৩০% রপ্তানি ইনসেনটিভ চেয়েছি। সরকারের কাছ থেকে এ সুবিধা পেলে আমরা কম দামে ওষুধ সরবরাহ করতে পারবো। এতে আমাদের রপ্তানি বাজার আরো বৃদ্ধি পাবে।' তাছাড়া এ খাতে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক মুক্ত করা প্রয়োজন।

কোটা মুক্ত করে দেবার পর আমাদের গার্মেন্টস খাত থেকে আয় কিছুটা হলেও কমবে। কিন্তু ওষুধ শিল্পে আমাদের যে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেছে তা কাজে লাগাতে পারলে পোশাক শিল্পের ক্ষতিটা হয়তো পুষিয়ে নিতে পারবো।

ছবি : **সালাউদ্দিন টিটু**